অধ্যায় ৪: বল (Force)

বল : যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় বা গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে বল বলে। বলকে F দ্বারা সূচিত করা হয়। বল একটি ভেক্টর বা দিক রাশি। কারণ এর মান ও দিক উভয়ই আছে। বলের আন্তর্জাতিক একক নিউটন (N)। বলের মাত্রা $[F] = [MLT^{-2}]$

বিভিন্ন ধরনের বল

স্পর্শ বল : যে বল সৃষ্টির জন্য দুইটি বস্তুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের প্রয়োজন তাকে স্পর্শ বল বলে। স্পর্শ বলের উদাহরণ হলো ঘর্ষণ বল। টান বল এবং সংঘর্ষের সময় সৃষ্ট বল। যেমন : মেঝের উপর দিয়ে একটি বাক্স টেনে নেওয়ার সময় আমরা টান বল প্রয়োগ করি। বাক্সের গতির বিপরীত দিকে তখন ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয়।

অস্পর্শ বল : দুটি বস্তুর প্রত্যক্ষ স্পর্শ ছাড়াই যে বল ক্রিয়া করে তাকে অস্পর্শ বল বলে। যেমন : দুটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণমূলক মহাকর্ষ বল, দুটি আহ্নিক বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণকারী তড়িৎ বল, দুটি চুম্বকের মেরুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণমূলক বল অথবা চুম্বক ও একটি চৌম্বক পদার্থের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বলগুলো অস্পর্শ বল তথা দূরবর্তী বলের উদাহরণ।

সাম্য বল : কোনো বস্তুর উপর একাধিক বল ক্রিয়া করলে যদি বলের লব্ধি শূন্য হয় তবে সেই বলগুলোকে সাম্য বল বলে। ধরো, একটি বস্তুকে দুইজন যদি সমান বলে বিপরীত দিকে টানে তবে কি বস্তুটি কোনো দিকে যাবে? না। কারণ, এখানে একদিকের বলটি অন্যবলের সাথে ক্রিয়া করে শুন্য বল সৃষ্টি করবে।

অসাম্য বল : যে বল বা বলসমূহের প্রয়োগের ফলে বস্তু সাম্যাবস্থায় না থেকে এর উপর একটি লব্ধিবল ক্রিয়া করে তবে ঐ বল বা বলসমূহকে অসাম্য বল বলে।

মৌলিক বল (Fundamental Forces)

মৌলিক বলঃ যে বলসমূহ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এবং অন্য সকল বল এই বলগুলোরই কোনো না কোনো রূপ সেই বলগুলোকে মৌলিক বল বলে। মৌলিক বল চার প্রকার।

১। মহাকর্ষ বলঃ মহাবিশ্বের যেকোনো দুইটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল কাজ করে তাকে মহাকর্ষ বল বলে। তবে, পৃথিবীর সাথে অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যে যে মহাকর্ষ বল কাজ করে তাকে আমরা অভিকর্ষ বল বলে। আর এই অভিকর্ষ বল-ই হচ্ছে কোনো বস্তুর ওজন। **মহাকর্ষ বল সবচেয়ে দুর্বলতম মৌলিক বল। এই বলের পাল্লা হচ্ছে অসীম** অর্থাৎ এটা অসীম পর্যন্ত কাজ করে। এই বলের কারণেই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। মহাবিশ্বের সকল কণার মধ্যেই এই বল কাজ করে। (বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এই বল মূলত গ্রাভিটন নামক এক কণার কারণে সৃষ্ট)।

বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষ বল নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন যাকে মহাকর্ষ সূত্র বলা হয়।

মহাকর্ষ সূত্র

সূত্রঃ মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল বস্তু দ্বয়ের ভরের গুনফলের সমানুপাতিক এবং মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। এই বল বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী সংযোজক সরলরেখা বরাবর কাজ করে। একে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বলে।

প্রতিপাদনঃ ধরি, m_1 ও m_2 ভরের দুটি বস্তু পরস্পর d দূরত্বে অবস্থিত। তাহলে মহাকর্ষ সূত্র থেকে আমরা পাই,

মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল F এদের ভরের গুনফলের সমানুপাতিক,

অর্থাৎ, $F \propto m_1 m_2$ .....(1)

আবার এই বল বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক।

অর্থাৎ, , $F \propto \frac{1}{d^2}$ .....(2)

এখন (1) ও (2) থেকে আমরা পাই,

$F \propto \frac{m_1 m_2}{d^2}$

$\therefore \quad F = G\frac{m_1 m_2}{d^2}$ [G হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক যার মান = 6.673×10^{-11} Nm^2Kg^2

ওজনঃ কোনো বস্তু ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল কে ওজন বলে। ধরি, m ভরের কোনো বস্তু আছে তাহলে এর ওজন হবে W=mg। আবার, পৃথিবীর ভর M ও ব্যাসার্ধ R হলে বস্তুটি ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল হবে,
তাহলে, আমরা লিখতে পারি,
আকর্ষণ বল = ওজন
বা, F = W
বা, $G\frac{mM}{R^2}$ = mg
বা, $G\frac{M}{R^2}$ = g
∴ g = $G\frac{M}{R^2}$

এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা **কোনো গ্রহের ভর ও ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকলে এর অভিকর্ষজ ত্বরণ নির্ণয় করতে পারি।**

যদি কোনো বস্তুকে ভূমি থেকে h উচ্চতায় নেওয়া হয় তখন সেখানে কার্যকর অভিকর্ষজ ত্বরণ,
g' = $G\frac{M}{(R+h)^2}$

২। তাড়িতচৌম্বক বলঃ দুইটি আহিত কণা তাদের মধ্যে চার্জের কারণে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল লাভ করে তাকে তাড়িতচৌম্বক বল বলে। দুইটি আহিত কণা যখন শুধু স্থির থাকে তখন এদের মধ্যে তড়িৎ বল কাজ করে কিন্তু গতিশীল থাকলে তার মধ্যে চৌম্বক বলও কাজ করে।
৩। দুর্বল নিউক্লিয় বলঃ যে স্বল্প পাল্লার ও স্বল্প মানের বল নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা মৌলিক কণার মধ্যে কাজ করে নিউক্লিয়াসের মধ্যে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে তাকে দুর্বল নিউক্লিয় বল বলে। যখন কোনো নিউক্লিয়াস থেকে β রশ্মি নির্গত হয় তখন দুর্বল নিউক্লিয় বল সৃষ্টি হয়।
৪। সবল নিউক্লিয় বলঃ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয় উপাদান কে একত্রে আবদ্ধ রাখে যে বল তাকে সবল নিউক্লিয় বল বলে। এই বল মূলত প্রোটন ও নিউট্রনকে নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ রাখে।

জড়তা (Inertia)

কোনো বস্তু যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে জড়তা বলে। যেহেতু কোনো বস্তু দুই অবস্থায় থাকতে পারে স্থিতিশীল বা গতিশীল, তাই জড়তাও দুই প্রকার।
১। স্থিতি জড়তাঃ কোনো স্থির বস্তুর স্থির থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে স্থিতি জড়তা বলে।
২। গতি জড়তাঃ কোনো গতিশীল বস্তুর গতিশীল থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে গতি জড়তা বলে।
আর জড়তা নির্ভর করে বস্তুর ভরের উপর তাই ভর হচ্ছে জড়তার পরিমাপক। কারণ, কোনো বস্তুর ভর যত বেশি হয় জড়তা তত বেশি হয়।
স্থিতি জড়তার উদাহরণঃ আমরা যখন কোনো গাড়িতে উঠে বসার পর গাড়িটি চলতে শুরু করে তখন আমরা পিছনের দিকে হেলে যাই এর কারণ হচ্ছে গাড়িটি গতিশীল হওয়ার আগে যে স্থির অবস্থায় ছিল আমরাও সেই অবস্থায়ই থাকতে চাই। আর একারণেই গাড়িটি চলতে শুরু করলেও আমরা পিছনের অবস্থাতেই থাকতে চাই। আর তাই আমরা পিছনে হেলে যাই।
গতি জড়তার উদাহরণঃ আমরা যখন কোনো গতিশীল গাড়িতে থাকি এবং তা চলতে থাকে তখন আমরাও চলতে থাকি একই গতিতে। আর গাড়িটি ব্রেক করলে আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে যাই। কারণ, আমরা যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থাতেই থাকতে চাই। আর এই কারণে গাড়ি থেমে যেতে চাইলেও আমরা আগের মতোই গতিশীল থাকতে চাই। আর আমাদের গতি জড়তার কারণেই মূলত আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে যাই।

নিউটনের সূত্র সমূহ

প্রথম সূত্রঃ বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করা হলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সমবেগে চলতে থাকবে।

ব্যাখাঃ আমরা যখন কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করি তখন তা গতিশীল হয় বা হওয়ার চেষ্টা করে। আবার, কোনো বস্তুকে থামাতে চাইলে বস্তুর গতির বিপরীতে বল প্রদান করতে হয়। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যদি কোনো বল কে মাঠে ছোঁড়া হয় তখন এর গতি ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং একটা সময় থেমে যায়। এর কারণ হচ্ছে, মাঠ ও বলের মধ্যে একটি ঘর্ষণ বল কাজ করে যার কারণে বলের গতি ধীরে ধীরে কমে যায় এবং এক সময় থেমে যায়। কিন্তু এই একই বল আমরা যদি মহাশুন্যে নিক্ষেপ করতাম তখন এটি একই গতিতে চিরকাল চলতে থাকতো। কারণ, মহাশুন্যে ঘর্ষণ হওয়ার মতো কিছু নেই।

ভরবেগ: বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে। কোনো বস্তুর ভর m এবং বেগ v হলে এর ভরবেগ, p = mv।
ভরবেগের একক: $kg\ ms^{-1}$ ভরবেগের মাত্রা : $[p] = [MLT^{-1}]$

দ্বিতীয় সূত্রঃ কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এর ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক। এবং বল যেদিকে প্রয়োগ করা হয় বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

ব্যাখাঃ ধরি, m ভরের কোনো বস্তুর আদিবেগ u এবং এতে t সময় ধরে F পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয় এবং এতে এর বেগ পরিবর্তিত হয়ে v হয়।
তাহলে, আমরা বলতে পারি, বস্তুটির আদি ভরবেগ = mu এবং বস্তুটির শেষ ভরবেগ= mv
তাহলে, ভরবেগের পরিবর্তন = mv-mu
সময়ের সাথে ভরবেগ পরিবর্তনের হার = $\frac{mv-mu}{t}$

নিউটনের সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি এই ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমান।

অর্থাৎ, $\mathbf{F = \frac{mv-mu}{t}}$

আবার, $F = \frac{m(v-u)}{t} = ma$ $\quad (a = \frac{v-u}{t})$
$\therefore \boldsymbol{F = ma}$

বলের ঘাতঃ বল ও সময়ের গুনফলকে বলের ঘাত বলা হয়। উপরের সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি,
বলের ঘাত $= \boldsymbol{F \times t = mv - mu}$
অর্থাৎ, বলের ঘাত হচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তনের সমান।

ঘাত বলঃ যে অত্যধিক বলের মান খুব অল্প সময় ধরে ক্রিয়া করে তাকে ঘাত বল বলে। যেমনঃ ক্রিকেট বলকে ব্যাট দিয়ে আঘাত করা। এটি একটি ঘাত বল।
তাহলে, বলা যায় ঘাত বল একটি বিশেষ ধরনের বল অন্যদিক বলের ঘাত হচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তন।

তৃতীয় সূত্রঃ "প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে"

আমরা যখন কোনো বস্তুর উপর কোনো বল প্রদান করি সেই বস্তুটিও একই পরিমাণ বল আমাদের দিকে ফেরত দেয়। আমরা এটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি যখন আমরা হাঁটি। হাঁটার সময় মাটিতে আমরা পায়ের মাধ্যমে বল প্রদান করি এবং মাটি সেই একই পরিমাণ বল আমাদের আবার ফেরত দেয় যার কারণে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই কিন্তু যদি মাটি সেই পরিমাণ বল না দিতে পারে তখন আমরা হাঁটতে পারিনা। যেমন, বালি যুক্ত এলাকায় আমরা যখন হাঁটি তখন বালি একই পরিমাণ বলা আমাদের দিতে পারেনা বরং বালি পায়ের নিচে থেকে সরে যায়। একারণে, বালিতে হাঁটা আমাদের জন্য অনেক কষ্টের হয়।

সংঘর্ষ (Collision)

নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি,
কোনো বস্তুর উপর একটি বস্তু যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করে ঠিক একই পরিমাণ বল দ্বিতীয় বস্তু প্রথম বস্তুর উপরেও প্রয়োগ করবে।
তাহলে বলা যায়,
যদি প্রথম গাড়িটি F_1 বল ও দ্বিতীয় গাড়ি F_2 পরিমাণ বল দেয় তাহলে,
$F1 = -F2$ হবে।
যখন একাধিক গাড়ি পরস্পর কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখনও একই ঘটনা ঘটে।
এমন সংঘর্ষের বেলায় দেখা যায়, দুটি বস্তুর সংঘর্ষের আগের ও পরের ভরবেগের সমষ্টি সমান থাকে। আর একে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র বলে।
অর্থাৎ, $\boldsymbol{m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2}$

স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষঃ যে সংঘর্ষে ভরবেগ ও গতিশক্তি সংরক্ষিত হয় তাকে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ বলে। এক্ষেত্রে, আমরা লিখতে পারি,

$$\frac{1}{2}m_1u_1^2 + \frac{1}{2}m_2u_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ও গতিশক্তির সংরক্ষণ সূত্র সমন্বয় করে পাই,

$$\boldsymbol{v_1 = \frac{(m_1-m_2)u_1+2m_2u_2}{m_1+m_2}}$$

$$\boldsymbol{v_2 = \frac{(m_2-m_1)u_2+2m_1u_1}{m_1+m_2}}$$

স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে, এই সূত্রের মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে দুইটি বস্তুর শেষ বেগ নির্ণয় করা যায়।

ঘর্ষণ বল (Friction Force)

দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে যদি একটির উপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা করে অথবা চলতে থাকে তাহলে বস্তুদ্বয়ের স্পর্শ তলে এই গতির বিরুদ্ধে একটা বাধার উৎপত্তি হয়, এই বাধাকে ঘর্ষণ বলে। আর এই বাধার ফলে যে বল উৎপন্ন হয় তাকে ঘর্ষণ বল বলে। মসৃণ অপেক্ষা অমসৃণ তলে ঘর্ষণ বেশি হয়।

চার ধরনের ঘর্ষণ বল হয়, যথাঃ

ক) স্থিতি ঘর্ষণঃ একটি বস্তু যখন অন্য কোনো বস্তুর উপর স্থির থাকে, তখন এদের মধ্যে যে ঘর্ষণ বল কাজ করে তাকে স্থিতি ঘর্ষণ বল বলে।

খ) গতি ঘর্ষণঃ একটি বস্তু যখন অন্য কোনো বস্তুর উপর গতিশীল অবস্থায় চলতে থাকে তখন তাকে গতি ঘর্ষণ বল বা বিসর্প ঘর্ষণ বলে।

গ) আবর্ত ঘর্ষণঃ যখন কোনো বস্তু অন্য একটি বস্তুর উপর গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে থাকে তখন এদের মধ্যে যে ঘর্ষণ বল কাজ করে তখন তাকে আবর্ত ঘর্ষণ বল বলে। যেমনঃ গাড়ির চাকা।

ঘ) প্রবাহী ঘর্ষণঃ প্রবাহী ঘর্ষণ জানার আগে, আমাদের জানতে হবে প্রবাহী কি। প্রবাহী হচ্ছে সেই সকল পদার্থ যেগুলো প্রবাহিত হতে পারে। যেমনঃ তরল ও বায়বীয় পদার্থ। আর যখন কোনো বস্তু কোনো প্রবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে গতিশীল থাকে তখন যে ঘর্ষণ বল কাজ করে তখন তাকে প্রবাহী ঘর্ষণ বল বলে। যেমনঃ প্যারাসুট দিয়ে একজন উপর থেকে নিচে নামার সময় বাতাসের ঘর্ষণ বলের কারণে প্যারাসুট টি ধীরে ধীরে নিচে নামে।

প্রযুক্ত বলের সাথে ঘর্ষণ বলের সম্পর্ক

আমরা যখন কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করি তখন সেই বল কে প্রযুক্ত বল বলা হয়। আর, কার্যকর বল হচ্ছে সেই বল যে বল বস্তুর উপর কাজ করে বা ত্বরণ সৃষ্টি করে। সবসময়, প্রযুক্ত বল থেকে ঘর্ষণ বল বাদ দিলে কার্যকর বল পাওয়া যায়। ধরি, কোনো বস্তুর উপর আমরা F পরিমাণ বল প্রয়োগ করেছি, বস্তুর সাথে তলের ঘর্ষণ বল ছিল F_s নিউটন।

তাহলে কার্যকর বল, $F_{net} = F-F_s$

এই কারণে, কোনো বস্তুর ত্বরণ পরিমাপের সময় আমাদের এই ভাবে হিসাব করতে হবে।

ঘর্ষণ গুনাঙ্ক ও ঘর্ষণ কোণঃ যখন কোনো বস্তুকে সমতলে রাখা হয় যার ওজন W N এবং তলের সাথে বস্তুর ঘর্ষণ বল F_s তখন এদের অনুপাত হচ্ছে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক।

অর্থাৎ, ঘর্ষণ গুণাঙ্ক $\mu_s = \frac{W}{F_s}$

আবার সেই তলকে যদি আমরা একদিক থেকে কিছুটা উচু করে হেলানো তলে পরিণত করি তখন একটি নির্দিষ্ট কোণে বস্তুটি তল থেকে নিচের দিকে পড়ে যেতে শুরু করে। এই কোণটি হচ্ছে ঘর্ষণ কোণ।

ঘর্ষণ কোণ যদি θ হয় তবে,

$$tan\theta = \mu_s = \frac{W}{F_s}$$

"ঘর্ষণ বল হচ্ছে একটি প্রয়োজনীয় অসুবিধা"

ঘর্ষণের সুবিধা : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘর্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ঘর্ষণের সুবিধা হলো :

- ঘর্ষণের জন্য আমরা হাঁটতে পারি, পিছলে যাই না;
- ঘর্ষণের জন্য আমরা কোনো কিছু ধরে রাখতে পারি;
- ঘর্ষণের জন্য গাড়ির চাকা ঘোরে এবং সামনে বা পেছনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে;
- কাঠে পেরেক বা স্ক্রু লাগাতে পারি;
- কাঁচি বা ছুরিতে ধার দিতে পারি।

ঘর্ষণের অসুবিধা : ঘর্ষণের জন্য আমাদের অসুবিধাও কম পোহাতে হয় না। যন্ত্র চলার সময় গতিশীল অংশগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ ক্রিয়ার ফলে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাছাড়া যান্ত্রিক দক্ষতাও বেশ কমে যায়। আবার ঘর্ষণের ফলে অনাবশ্যক তাপ উৎপাদনের জন্য যন্ত্রের ক্ষতি হয়।

এসব অসুবিধা দূর করার জন্য যন্ত্রপাতির স্পর্শ তলগুলোর মাঝে পিচ্ছিলকারী তেল বা গ্রাফাইট ব্যবহার করে পিচ্ছিল রাখা হয়।